‘আমার পুরো সময় আমি দিতে চাই উপন্যাস রচনায়’

রাবেয়া খাতুন

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মারুফ রায়হান**

কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুনের জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে মামার বাড়িতে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সালে। বাবা মৌলবী মোহাম্মদ মুল্লুক চাঁদ, মহামিদা খাতুন। চার সন্তানের জননী সাগর, কেকা, প্রবাল ও কাকলী। স্বামী চিত্রপরিচালক এ.টি.এম ফজলুল হক।

প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘প্রশ্ন’ পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রগতিশীল সাপ্তাহিক ‘যুগের দাবী’তে ছাপা হয়। পুস্তক আকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস ‘মধুমতি’, উপজীব্য বাংলাদেশের মুসলিম তাঁতী সম্প্রদায়। এক সময় শিক্ষকতা করেছেন। সাংবাদিকতার সঙ্গেও দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। ইত্তেফাক, সিনেমা, খাওয়াতীন পত্রিকা ছাড়াও তার নিজের সম্পাদনায় পঞ্চাশ দশকে বেরুতো ‘অঙ্গনা’ নামের একটি মহিলা মাসিক পত্রিকা। তার প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা সত্তর। এর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস, গবেষণাধর্মী রচনা, ছোটগল্প, ধর্মীয় কাহিনী, ভ্রমণ কাহিনী, কিশোর উপন্যাস, স্মৃতিকথা। দেশ-বিদেশের রেডিও, টিভি থেকে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে অসংখ্য নাটক, জীবন্তিকা ও সিরিজ নাটক।

দীর্ঘদিন ধরে জড়িত শিল্প-সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে। বাংলা একাডেমীর কাউন্সিল মেম্বার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের গঠনতন্ত্র পরিচালনা পরিষদের সদস্য, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জুরী বোর্ডের বিচারক, শিশু একাডেমীর কাউন্সিল মেম্বার ও টেলিভিশনের ‘নতুন কুঁড়ি’র বিচারক। এছাড়া যুক্ত বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, ঢাকা লেডিজ ক্লাব, বিজনেস ও প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব, বাংলাদেশ লেখক শিবির, বাংলাদেশ কথাশিল্পী সংসদ ও মহিলা সমিতির সঙ্গে।

উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন একুশে পদক (১৯৯৩), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৩), নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯৫), বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৯৪), জসীমউদ্‌দীন পুরস্কার, শেরেবাংলা স্বর্ণপদক (১৯৯৬), ঋষিজ সাহিত্য পদক (১৯৯৮), লায়লা সামাদ পুরস্কার (১৯৯৯), অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯), অতীশ দীপঙ্কর পুরস্কার (১৯৯৮)। ছোট গল্পের জন্য লাভ করেছেন নাট্যসভা পুরস্কার (১৯৯৮), সায়েন্স ফিকশন কিশোর উপন্যাসের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন শাপলা দোয়েল পুরস্কারে (১৯৯৬)। তাঁর ছোটগল্প অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি ও ইরানি ভাষায়। ইংরেজিতে অনুবাদ হচ্ছে- ‘মধুমতি’ উপন্যাস। মধ্য ষাটের দশকে তার কিশোর উপন্যাস ‘দুঃসাহসী অভিযান’ চিত্রায়িত হয়েছিল ‘প্রেসিডেন্ট’ নামে। সেটি ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম শিশু-কিশোর চলচ্চিত্র।

সাপ্তাহিক ২০০০ : এবারের একুশের মেলায় আপনার দশটি বই প্রকাশিত হয়েছে। আপনার অনুভূতি কী?

রাবেয়া খাতুন : একসঙ্গে দশটি নতুন বই প্রকাশিত হওয়া যে কোনো লেখকের জন্যে একটি মাইলস্টোনই বলতে হবে। আমার জন্যে এটি প্রথম ঘটনা। সারা জীবনে একসঙ্গে দশটি বই বেরোয়নি আমার। আগামীতেও বেরুবে কি না জানি না। অবশ্য একবার আমার আটটি বই বেরিয়েছিল একসঙ্গে। আসলে দশটি বই যে বেরুলো, সেটা সম্ভব হয়েছে প্রকাশকদের উপর্যুপরি তাগাদার কারণে। আমি খুবই খুশি হয়েছি, কিন্তু পরে আমাকে কিছুটা তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেটা হলো, সাধারণত আমার বইয়ের চূড়ান্ত প্রুফ আমি নিজেই দেখি কিন্তু এবার সবগুলো বইয়ের ফাইনাল প্রুফ আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। বেশ কিছু মুদ্রণত্রুটি থেকে গেছে। এ ঘটনার কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এক বছরে পাঁচটির বেশি বই আমি পাবলিকদের দেব না। তাহলে সবগুলো পাণ্ডুলিপির প্রতি সুবিচার করা হবে। সন্তুষ্টি নিয়ে প্রুফ দেখতে পারবো।

২০০০ : একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসছে। প্রকাশিত দশটি বই-ই কি আপনার নতুন লেখা? মানে সাম্প্রতিককালে লেখা?

রাবেয়া : না, ঠিক তা নয়। চারটি উপন্যাস আর একটি ভ্রমণ কাহিনী অতি সাম্প্রতিক। গত ঈদ সংখ্যাগুলোয় ওগুলো প্রকাশিত হয়, বই হিসেবে বেরুলো তার কয়েক মাস পর

ফেব্রুয়ারির মেলায়। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র, ছোট গল্প সংগ্রহ 'তোমার কাছে যাব বলে'। 'দশটি উপন্যাস' এ সবই তো সংকলন গ্রন্থ। আগে প্রকাশিত লেখাগুলো নিয়েই বড় আকারের সংকলন গ্রন্থ বেরুলো। যে গল্প সংগ্রহের কথা বললাম সেটির ভেতর প্রায় কুড়িটি গল্প আছে যেগুলো প্রবাসের পটভূমিতে লেখা।

২০০০ : এখন একসঙ্গে আপনার দশটি উপন্যাস, সাতটি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস- এভাবে উপন্যাসের সংগ্রহ বেরুচ্ছে। আপনার প্রথম উপন্যাসটি বেরিয়েছিল তো মধ্য ষাটে। তাহলে কি ষাট বা তার অব্যবহিত আগের দশক পঞ্চাশেই আপনার সাহিত্যচর্চার সূচনা?

রাবেয়া : না, না। তারও আগে থেকে লিখি আমি। একেবারে কৈশোরেই আমার লেখালেখির শুরু। বারো-চৌদ্দ বছরেই আমি একাধিক উপন্যাস লিখে ফেলি। ছোটগল্প লিখতাম না, ছোটগল্প সম্পর্কে ধারণাও তেমন স্বচ্ছ ছিল না তখন। সেসব লেখার কয়েকটি এখনও আমার আলমারিতে সংরক্ষিত আছে। সেগুলো তো আর ছাপাতে দিইনি। বড় খাতাভর্তি পিঁপড়ার সারির মতো অক্ষর। দেখলে অবাকই লাগে, আমিই লিখেছিলাম এসব উপন্যাস! আসলে সিনেমা দেখার একটা প্রভাব পড়েছিল আমার ওপর। মাসে দুটো সিনেমা তো দেখতামই। আব্বা এবং আমার বড় ভাই ও বোন খুব সুন্দর করে সুন্দর সুন্দর গল্প বলতে পারতেন। সিনেমা দেখা আর গল্প শোনা যে মেয়েটির নেশা, সে তো নিজেই গল্প শোনাতে চাইবে। সেখান থেকেই বোধহয় উপাখ্যান লেখার সূচনা ও প্রেরণা। আমার কাজিন একদিন বললেন, এভাবে খাতা ভর্তি করে উপন্যাস লিখে আলমারিতে ভরে রাখলে তো চলবে না। ছোটগল্প লিখতে হবে। তখন আমি ফাইভ-সিক্সে পড়ি, অথচ অনেক উপন্যাস পড়ে ফেলেছি। যেমন 'নৌকাডুবি' 'রামের সুমতি'। পাঠ্যপুস্তকের আড়ালে নভেল পড়ার জন্য মায়ের বকুনি খেয়েছি অনেক। তখনকার মায়েদের চিন্তা ছিল মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভালো পাত্রস্থ করার। এখন মেয়ে যদি ক্লাসের পড়া না পড়ে উপন্যাস পড়ে, তাহলে তো পরীক্ষায় ভালো ফল করবে না। ভালো ফল না করলে ভালো পাত্রই বা জুটবে কী করে?

২০০০ : শৈশবে সাহিত্য না বুঝে লেখা আর পরবর্তীকালে সিরিয়াসলি পাঠকের জন্য লেখা- এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে আপনার উত্তরণ কীভাবে ঘটলো।

রাবেয়া : ভাইয়ের কথায় ছোটগল্প লিখে পত্রিকায় পাঠাতে শুরু করলাম। সফলতা এলো না। হয় গল্প ফেরত আসে, নয়তো পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়। এভাবেই চললো কয়েক বছর। তখন শেকস্পিয়র হাতে নিলাম। পড়তে পড়তে দেখি যে, আশ্চর্য! এর অনেক কাহিনীই তো আমি জানি! জানি মানে শুনেছি ভাইয়ের কাছে। একইভাবে রবি ঠাকুরের অনেক গল্পই আমার জানা ছিল। আমার ওই কৈশোর-তারুণ্যের সময়ে বাংলায় বড় বড় পালাবদল ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা- এসবের আঁচ এসে লাগলো আমাদের জীবনে। আমার অবচেতন মনে নিশ্চয়ই তার প্রতিঘাত পড়তো। মনে আছে, পুরনো ঢাকায় আমাদের বাড়ির সামনে বিশাল ডেকচিতে লাবড়া রান্না চলছে। কঠিন মন্বন্তর তখন। চারদিকে হাহাকার। সবচেয়ে ভালো চালের মণ তখন চার টাকা থেকে লাফিয়ে উঠেছে আশি টাকায়। পাড়ার নিম্ন-মধ্যবিত্তদের দেখেছি বাসন নিয়ে ওই লঙ্গরখানার লাইনে দাঁড়াতে। আমার খেলার সাথীদের কাউকে কাউকে দেখেছি সেই লাইনে। মাঝেমধ্যে খুব পচা গন্ধ আসতো। জানলাম গুদামে পচে যাওয়া চাল দিয়ে লঙ্গরখানার রান্না হচ্ছে। রায়টের কথাও মনে আছে। সে সময় কাজকর্ম ভাগ করা ছিল ধর্মভেদে। যেমন দর্জি মানে মুসলমান, মুদিখানার দোকানদার বা দুধঅলা ছিল হিন্দু। দাঙ্গার সময়ে আমাদের দুধঅলাকে দেখলাম চারজন ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই সবকিছুই আমার মনের টেপে রেকর্ড হয়ে যেত। দেশ ভাগের পর পরিচিত অনেকেই ঢাকা ছেড়ে চলে গেল। তখন ঢাকা বলতে তো বোঝা তো ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন আর সদরঘাট বা বুড়িগঙ্গার পাড়। শান্তিনগরের দিকে তখন হিন্দুদের বাস ছিল। ওই এলাকার চেহারা সে সময়ে 'তপোবন তপোবন' ছিল। এতো সুন্দর। হিন্দুরা চলে যেতে থাকলো কোলকাতায়। আর কোলকাতা থেকে মুসলমান বাঙালিরা আসতে শুরু করলো ঢাকায়। আব্বা-চাচারা মিলে শান্তিনগরে জমি কিনলেন। আমাদের ভাগে যে জমি পড়লো সেটা ছিলো পাঁচ কাঠার মতো। প্রচুর গাছপালা, সেখানে একতলা একটা বাড়িও ছিল। মূল্য সর্বসাকুল্যে পাঁচ হাজার টাকা। ওই বাড়িতে আমরা উঠে গেলাম। প্রতিবেশী হিসেবে পেলাম কবি গোলাম মোস্তফাকে। ওই এলাকায় ধীরে ধীরে অনেকেই বাস করতে শুরু করলেন। ছিলেন জয়নুল আবেদীন, আনিসুজ্জামান, মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল। আমাদের এই বাসবদল এবং পরিবেশ বদল- সবই আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে সময় বিখ্যাত পত্রিকাগুলোর মধ্যে ছিল- 'নওবাহার' 'দিলরুবা' 'যুগের দাবী' 'ইনসাফ'। সাপ্তাহিক যুগের দাবীতে বেরুলো আমার প্রথম গল্প। সেটি কিন্তু কোনো রোমান্টিক গল্প নয়, নির্যাতিত নারীর গল্প। সেই অর্ধশতাব্দীকাল আগে লেখা গল্পের চরিত্রগুলো তো আজও রয়ে গেছে আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে।

২০০০ : তার মানে চারপাশের জীবন এবং সময়ের পাশ ফেরা আপনাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল বলেই সিনেমাপ্রিয় রোমান্টিক কাহিনীকার হয়ে উঠলেন বাস্তবনির্ভর গল্পকার।

রাবেয়া : আমার প্রথম উপন্যাস 'মধুমতি'ও রোমান্টিক উপন্যাস নয়, তাঁতীদের জীবন নিয়ে লেখা। আমাদের দেশের বাড়ি তো বিক্রমপুরে। দাদা ছিলেন ওই অঞ্চলের প্রথম কবিরাজ। সেখানে মস্‌লিনের কাপড় তৈরি করতো যেসব তাঁতী, তাদের আমি খুব কাছ থেকেই পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছি। পুজোর এক মাসের ছুটিতে ঢাকা থেকে চলে যেতাম বিক্রমপুরে। দাদার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতাম। দেখতাম একটা তাঁতী পরিবারের প্রতিটি সদস্যই, বালক হোক আর বৃদ্ধ হোক- তাঁত বোনার কাজে যুক্ত থাকছে। বড় হওয়ার পর তিন বছর ধরে এই তাঁতীদের জীবন যাপন, কর্ম পদ্ধতির খুঁটিনাটি দিক আমি নোট করেছি। প্রচুর ইন্টারভিউ করেছি। তারপর 'মধুমতি' লিখতে শুরু করি।

২০০০ : 'মধুমতি' প্রকাশের সময় থেকেই কি আপনি লেখালেখিতে নিয়মিত?

রাবেয়া : ঠিক তা নয়, আমি তখন পুরদস্তুর গৃহিণী, সংসারী। সংসারের প্রতিটি কাজে আমি গভীরভাবে নিবেদিত, নিয়োজিত। বলা যায়, আমি তখন পূর্ণ কর্তব্যপরায়ণ গৃহিণী। তবে বই পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক কখনো নষ্ট হয়নি। বছরের পর বছর কিছু লিখছি না, নিজের ভেতর এক ধরনের অপরাধবোধ তৈরি হচ্ছে না লেখার কারণে। সেরকম সংকট মুহূর্তে একদিন কবি আহসান হাবীব বললেন, না লিখতে পারলেও প্রচুর পড়বে। প্রতিদিনই পড়বে। আজো তাঁর সেই উপদেশ মেনে চলেছি। ঘোর সংসার জীবনে খুবই অনিয়মিত ছিলাম লেখায়। বলা যায়, আশির দশক থেকেই আমি লেখালেখিতে নিয়মিত। তখন সংসারের হালও আমাকে ধরতে হয়েছে। সংসার নির্বাহের একটা প্রধান অবলম্বনও ছিল এই লেখালেখি।

২০০০ : অর্থোপার্জনের জন্যে লেখালেখি করতে গিয়ে তার শিল্পমান নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ন হয়?

রাবেয়া : তা হয়তো কিছুটা হয়। তবে সব লেখাই কি আর ভালো হয় একজন লেখকের? আমারও সেরকম হয়েছে। সংসারের হাল যখন আমার বড় ছেলে সাগর পুরোপুরিভাবে ধরলো, তখন থেকেই আসলে আমি ফুলটাইম লেখক। তখন একটা চাহিদাও তৈরি হয়ে গেছে আমার লেখার। সম্পাদক এবং প্রকাশকদের তাগদা আসছে নিয়মিতভাবেই।

২০০০ : আপনার সময়ে কে কে গল্প-উপন্যাস লিখতেন? তখনকার কথাসাহিত্যের পরিবেশ কেমন ছিল?

রাবেয়া : পঞ্চাশের দশকে এখানে ভালো ছাপাখানাই বা কয়টা ছিল, কয়জন প্রকাশক ছিলেন, কয়টা পত্রিকাই বা ছিল। এর ভেতরেই সমবেতন প্রচেষ্টায় আমাদের কথাসাহিত্য এগিয়ে গেছে। আবদুল গাফফার চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মিরজা আবদুল হাই, জহির রায়হান, রাজিয়া খান আমিন- সে সময়ের উজ্জ্বল নাম। সে সময়ে আমরা ছিলাম

কোলকাতামুখী, কোলকাতার পাঠক সংখ্যাও ছিল বেশি। সেসব পাঠকের মন জয় করতে পেরেছিল আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সেই জায়গা থেকে গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের তাৎপর্যপূর্ণ উত্তরণ ঘটেছে। এর নেপথ্যে পাঠকের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

সে সময়ের কথা বলতে গেলে সিনেমা পত্রিকার কথা না এসে পারে না। আমি, আমার স্বামী, জহির রায়হান এবং কাইয়ুম চৌধুরী- চারজনে মিলে পত্রিকাটা বের করতাম। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে একটা আড্ডা বসতো। বয়স্কদের ভেতর ওবায়দুল হক, আহসান হাবীব প্রায়ই আসতেন। আড্ডা বেশ জমতো। চা-মুড়ি খাওয়া হতো। মাঝে মাঝে সিনিয়র ওই দু'জনের মাধ্যমে আড্ডায় পেস্ট্রি আসতো। ওই আড্ডায় অবশ্য আর কোনো নারী সদস্য ছিলেন না আমি ছাড়া।

২০০০ : আপনার সময়ে নারী লেখকদের ভেতর কে কে ভালো লিখতেন?

রাবেয়া : রাজিয়া খান আমিন ভালো লিখতেন। তিনি নিয়মিত লিখলে আমাদের সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ হতো।

২০০০ : লেখক লেখকই, তার নারী-পুরুষ বিভেদ চলে না। যদিও নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে সামাজিক কিছু সুবিধা বা অসুবিধা তো থেকেই যায়। উভয়ের অভিজ্ঞতা অর্জনে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। আপনার কী মনে হয়?

রাবেয়া : নারী হওয়ার কারণে আমাকে কিছু খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তো হতে হয়েছেই। সব আমলেই কিছু নারী থাকেন যারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সমালোচিত হওয়ার মতো তৎপরতা চালান। তারা প্রকারান্তরে অন্য নারী লেখকদের ক্ষতিসাধনই করেন। আজকের সমাজ অনেক অগ্রসর। এখন একজন নারী লেখক খুব সহজেই একজন প্রকাশক বা সম্পাদকের কার্যালয়ে পৌঁছাতে পারেন। আমাদের কালে সেটা সম্ভব ছিল না।

অন্যদিকে যদি তাকাই তো বলতে হয়, *অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারীর দৃষ্টি অনেক বেশি তুখোড়। তবে তার সীমাবদ্ধতা হলো, নারীরা যা অনুভব করেন, গভীরভাবে বুঝতে পারেন সেটা পূর্ণাঙ্গভাবে লেখায় প্রকাশ করায় অসুবিধা থাকে। এটা বাস্তবতা। একজন নারী সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারেন না প্রথাগত ধ্যানধারণার এই সমাজ বাস্তবতায়।* আমার 'নিষিদ্ধ রমণী' গল্পের পরিণত বয়সের বিধবা নারী দশ বছর কম বয়সী পুরুষের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক গড়ে তুললেও সেই সম্পর্ক আর বিকশিত এবং প্রকাশিত হতে পারে না। একজন মধ্য তিরিশের যুবক বিপত্নীক হলে তার পক্ষে সহজেই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করা সম্ভব। অথচ একই বয়সের একজন নারীর স্বামী প্রয়াত হলে তার পক্ষে পুনরায় সংসারী হওয়া প্রায় অসম্ভব। নারীর এমন ট্র্যাজেডির সঙ্গে কোনো পুরুষই পরিচিত হবে না। লেখালেখির জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে। অর্জিত জ্ঞান সংহত করে তবেই তো সৃষ্টি হবে মানসম্পন্ন সাহিত্য। একজন নারীর পক্ষে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় একটু দুরূহই বটে। আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। আমার উপনাসের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। আমি চেষ্টা করেছি বৃত্তের বাইরে যেতে, নতুন নতুন ঘটনার বিবরণ দিতে। অধিকাংশ উপন্যাস মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লেখা হলেও বিচিত্র চরিত্র এসেছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও লেখকের জন্য জরুরি হলো অন্তর্দৃষ্টি, ব্যাপক পঠন-পাঠন এবং দেশ- কাল রাজনীতি বিষয়ে সচেতনতা। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, লেখাকে বাস্তবসম্মত করে তোলার প্রয়োজনে আমি ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় গেছি, গভীর রাতে ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে দেখতে গেছি, সড়ক দুর্ঘটনার স্থান পরিদর্শন করেছি। এসব নিয়ে লিখলে কোনো সমালোচনা হয়নি। কিন্তু যখন পরকীয়া প্রেমের কাহিনী লিখলাম তখনই কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন যে, আপনার নিশ্চয়ই পারকীয়া প্রেমের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তা না হলে লিখলেন কীভাবে। অদ্ভুত কথা! মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে লেখার জন্য নিজেকে মরতে হবে? আমার তো মনে হয় পরকীয়া প্রেম খুবই মিষ্টি প্রেম।

২০০০ : পরকীয়া প্রেম নিঃসন্দেহে মিষ্টি প্রেম, তবে এর একটি অন্যদিকও আছে, সেটা হচ্ছে সম্পর্কের দায়বোধহীনতা। দুই সংসার থেকে দু'জন নারী পুরুষ মিষ্টি প্রেমে জড়ান। অথচ কর্তব্যের সময়ে প্রকাশ্যে পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন না। সম্পর্কটি জটিল বটে এবং কষ্টেরও।

রাবেয়া : হ্যাঁ, জটিল বটে। তবে অশ্লীল নয় সম্পর্কটি।

২০০০ : আমি অশ্লীলতার কথা বলিনি। বলেছি কষ্টের কথা।

রাবেয়া : হ্যাঁ, কষ্টের, অতি কষ্টের। এটা ভেতরে ভেতরে পুড়িয়ে মারে, বাইরে তার কোনো চিহ্ন থাকে না।

২০০০ : লেখার উপাদান সংগ্রহের জন্য তাহলে আপনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেন?

রাবেয়া : হ্যাঁ। একটি উপন্যাস আছে থাইল্যান্ডের পটভূমিতে। উপন্যাসটি লেখার জন্যই আমি তিন তিনবার গেছি থাইল্যান্ডে।

২০০০ : আপনি পঁয়তাল্লিশটি উপন্যাসের কথা বললেন। এছাড়াও শত শত গল্প লিখেছেন আপনি। আমরা কি বলতে পারি যে আপনার এসব গল্প-উপন্যাসের বড় অংশ জুড়েই রয়েছে? নারীর কথা?

রাবেয়া : না। আমার বিষয় কি নারী? আমার সাবজেক্ট কি পুরুষ? আমার লেখার বিষয় হলো মানুষ, মানুষের বিচিত্র জীবন।

২০০০ : কথাসাহিত্যিক হিসেবে দেশের বড় বড় সাহিত্য পুরস্কার আপনি পেয়েছেন। তারপরও কি আপনার এমনটা মনে হয়েছে, আপনাকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি?

রাবেয়া : হ্যাঁ মনে হয়। *আসলে আমাদের দেশের যা পরিস্থিতি, তাতে আমি কেন, অনেক লেখককেই সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। তবে পুরস্কার পাওয়া কোনো লেখকের লক্ষ্য হতে পারে না। পুরস্কার অর্জন নয়, আমার নিরন্তর চেষ্টা থাকে লেখায় শুদ্ধতা অর্জনের।*

২০০০ : শুধু গল্প-উপন্যাস তো না। আপনি নিরলসভাবে লিখে চলেছেন ভ্রমণ কাহিনী এবং টেলিভিশন নাটক।

রাবেয়া : আমার ভ্রমণ কাহিনী পড়ে অনেকেই বলেন যে, মনে হয় আমরাই ভ্রমণ করছি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেকে একজন কথাসাহিত্যিকই মনে করি। গল্প-উপন্যাসই প্রধানত লিখতে চাই। নাটক লেখার ব্যাপারটি এসেছে উপার্জনের প্রয়োজনে। বলতে পারেন সম্পূর্ণভাবে অর্থকরী দরকার থেকেই নাটক লেখা। নাটক লিখতে আমি পছন্দ করি না। ইউএসআইএস একটা প্রকল্প চালু করেছিল ষাটের দশকে। তারা আমাকে বিদেশী উপন্যাস দিতো। আমাকে সেটা অনুবাদ করে দিতে হতো বাংলায়। শুধু তাই নয়, ওই কাহিনীকে আধাঘন্টার শ্রুতিনাটকে রূপান্তর করেও দিতে হতো। এভাবেই শুরু। পরবর্তীকালে টেলিভিশন চালু হলে কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে নাটক লিখতে হয়েছে। ভালোলাগার জন্য লিখিনি। তখন অবশ্য টাকার প্রয়োজনে নয়, হয়তো এক ধরনের মোহ থেকে লিখেছি। কয়েক বছর হলো আমি আর নাটক লিখছি না। বলে দিয়েছি আমার গল্প-উপন্যাস থেকে কেউ যদি নাটক বানাতে চান তো বানাতে পারেন। আমি নাটক লিখতে পারবো না।

২০০০ : আর সিনেমা?

রাবেয়া : সিনেমা দেখা তো নেশা ছিল এক সময়। পরে সিনেমা পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত থেকেছি। এখনও সময় পেলে সিনেমা দেখি। অস্ট্রেলিয়ায় তিন-চার মাস করে থাকি। তখন প্রতিদিনই একটি করে সিনেমা দেখা হয়। সিনেমার স্ক্রিপ্ট লেখার আমন্ত্রণ এলো ইমপ্রেস টেলিফিল্ম থেকে, আমি আমন্ত্রণটা গ্রহণ করলাম সানন্দে। 'মেঘের পরে মেঘ' আমার পছন্দের একটি লেখা। শুধু স্ক্রিপ্ট লিখেই আমি আমার দায়িত্ব সারিনি, আমি শুটিংয়ে গেছি, পরিচালককে এমনকি নায়ক রিয়াজকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছি।

২০০০ : সম্পাদকের দপ্তর থেকে গল্প বা উপন্যাস লেখার আমন্ত্রণ এলে আপনি কোনটাকে আগে গ্রহণ করবেন?

রাবেয়া : অবশ্যই উপন্যাস। গোটা জীবনটাকে স্পর্শ করতেই আমার ভালো

লাগে। গল্প ইদানীং কম লিখছি। লেখালেখি এখন রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। না লিখে আমার উপায় নেই, সুস্থ থাকতে হলে আমাকে লিখতেই হবে।' বেঁচে থাকতে হলে আমাকে লিখতে হবে। যতদিন বাঁচি, লিখে যাব। আমার অনেক উপন্যাসের অনেক চরিত্রকে আমি যেন দেখতে পাই। ওরা আমার কাছে-পিঠেই ঘোরাঘুরি করে। আমার সন্তানদের তখন বলি, আমি আসলে তোমাদের ভেতরে এখন আর নেই। আমি আমার সৃষ্ট চরিত্রদের সঙ্গে বসবাস করছি।

২০০০ : চারপাশের জীবন থেকে চরিত্র আহরণ করেন লেখক, আবার কল্পনাশক্তি দিয়ে নির্মাণ করেন কোনো চরিত্র। দুটোই তো হয়।

রাবেয়া : আমার উপন্যাসের একজন নায়ক সৃষ্টি হতে পারে বাস্তব জীবনের তিনজন পুরুষকে নিয়ে। তিনজনের তিন রকম বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করতে পারে একজন একক নায়ক।

২০০০ : লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা কমিটমেন্টের কথা বলে থাকি আমরা। আপনার লেখালেখির নেপথ্যে এই ব্যাপারটি কিভাবে ক্রিয়াশীল?

রাবেয়া : শৈশবে আমি লেখালেখিতে যুক্ত হই মনের আনন্দের জন্যই। এখনো আমি আমার মনের আনন্দের জন্যই লিখি। লিখতে গিয়ে অনেক কষ্ট করতে হয়, সেই কষ্টেরও কোনো তুলনা হয় না। তার ভেতরেও তো আনন্দ আছে। আমি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে লিখতে বসি না। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য স্পষ্ট। প্রশংসায় আমি খুব উদ্বেলিত হই না, আবার কঠিন সমালোচনাও আমাকে তেমন আহত করে না। চেষ্টা করি নির্বিকার থাকতে।

২০০০ : নতুন প্রজন্মের লেখকদের লেখা আপনি পড়েন?

রারেয়া : হ্যাঁ পড়ি। অনেকের ভেতর সম্ভাবনা দেখি। আমাদের সময়ে আমরা একেকজন লেখকের সমগ্র সাহিত্য পাঠ করেছি। আমার মনে হয়েছে, এখন যারা লিখছে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের খোঁজ একদমই করছে না। বিদেশী সাহিত্যিক সম্পর্কে এরা যতো জানে ততটা নিজের দেশের সাহিত্যিকদের রচনা সম্পর্কে জানে না। বিদেশী সাহিত্য তো পড়তেই হবে। যদিও বিদেশী সাহিত্য বলতে এখন ইংরেজিই দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষা তো আমরা তেমন জানি না। যতো বেশি ভাষা জানা যাবে তত বেশি সাহিত্য পাঠের সুযোগ পাওয়া যাবে। তরুণদের সঙ্গে আলাপ করলে বুঝি যে, তারা নিজের দেশের সাহিত্য সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন।

২০০০ : 'মেঘের পরে মেঘ' লেখাটির প্রতি আপনি আপনার দুর্বলতার কথা জানিয়েছেন। এটা নিয়ে সিনেমাও হয়েছে।

বইমেলা

আমৃত্যু তারুণ্যের বন্ধু, কথাশিল্পী আহমদ ছফার ৬৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৩০ জুন থেকে ১১ জুলাই ২০০৪ ১২ দিনব্যাপী আহমদ ছফার বইসহ তাঁর উত্তর প্রজন্মের ৫ কথাশিল্পী শহীদুল জহির, মামুন হুসাইন, শাহাদুজ্জামান, শাহীন আখতারও মশিউর আলমের বইমেরা আয়োজন করা হয়েছে শ্রাবণ প্রকাশনীর বিক্রয় কেন্দ্র ২৮ আজিজ সুপার মার্কেট (১ম তলা) শাহবাগ, ঢাকায়।
৩০ জুন, বুধবার, ২০০৪ বিকেল ৫টায় বইমেলা উদ্বোধন করবেন কবি আসাদ চৌধুরী।

কিন্তু আপনি কি এই লেখাটিকে আপনার সেরা লেখা বলবেন?

রাবেয়া : মোটেও না। আমার সেরা লেখা সম্পর্কে আমি কিছু বলবো না। তবে পাঠকদের বিচারে 'বাহান্ন গলির এক গলি' (ঢাকাই সর্দারদের নিয়ে লেখা), 'মধুমতি', 'অনঙ্গ অন্বেষা', 'সাহেববাজার', 'মোহর আলী'- এসব লেখা ক্ল্যাসিক পর্যায়ের। একটা কথা বলি, আমি যখন লিখি, সেটা যতো ভালো লেখাই মনে করি না কেন, ওটা লিখিত হয়ে যাবার পর ওটার ওপর আর কোনো আকর্ষণ থাকে না। তখন আমি নতুন লেখার ভেতরে চলে যাই; আগের লেখাটা হয়ে ওঠে পরিত্যক্ত। তারপরও বলি, 'বাহান্ন গলির এক গলি', 'নীল নিশীথ'- এ দুটোর প্রতিও আমার দুর্বলতা আছে।

২০০০ : লেখক হিসেবে অতৃপ্তিবোধ আছে কিনা?

রাবেয়া : তাতো আছেই। আমি যা লিখতে চাই তা তো সব সময় লিখতে পারি না। ভাষায় কুলায় না, ভাবনায় কুলায় না। সমস্ত উপন্যাসটা ছবির মতো চোখের সামনে বয়ে চলেছে অথচ ঠিকঠাক মতো লিখতে পারছি না। এটা যে কী ভীষণ যন্ত্রণার ব্যাপার তা লেখক ছাড়া আর কেউ বুঝবেন না।

২০০০ : শিশু-কিশোরদের জন্যও তো আপনি লেখেন?

রাবেয়া : লিখি, তবে কম। আট-দশটি বই আছে, তবে নতুন করে লেখার সময় পাই না। অনেকেই লেখা চান। দিতে পারি না। সে জন্য তারা মাইন্ডও করেন। আমার পুরো সময়টা আসলে আমি দিতে চাই উপন্যাসে। জীবনকে কতো দিক দিয়েই না দেখার আছে।

২০০০ : সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভাঙা-গড়া চলে আঙ্গিকের দিক দিয়ে। আপনার ক্ষেত্রে...

রাবেয়া : আমার মনে হয়েছে, কবিতার যেমন ছন্দ আছে. উপন্যাসের তেমনি ছন্দ আছে। আমি আমার নিজের ক্ষেত্রে কখনো কখনো প্রমাণ পেয়েছি যে, উপন্যাস আপন গতিতে চলে। যখন যে শ্রেণীর, যে পেশার মানুষের কথা বলি উপন্যাসে তখন তার একটা নিজস্ব সুর বেজে চলে, ছন্দ বেজে ওঠে। আমার লেখায় সব সময়েই আমি ভাঙা-গড়ার কাজ করি। এমন উপন্যাসও আছে যা তিনবার কপি করেছি। আবার কোনো উপন্যাসকে পুরো ভেঙে ফেলে নতুন করে সাজিয়েছি।

২০০০ : আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা?

রাবেয়া : আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্যই আমরা করছি। বিষয়, আঙ্গিক এবং আধুনিকতা- এই তিনটির সমন্বয় যদি না থাকতো তাহলে দুই প্রজন্মের পাঠকের কাছে আমার লেখা পঠিত এবং প্রিয় হতো না।

২০০০ : লেখালেখির নেপথ্যে প্রেরণা কাজ করতে পারে। আবার একজন লেখক প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়ে যেতে পারেন। আপনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাটা কেমন?

রাবেয়া : একজন লেখকের জীবনে প্রতিবন্ধকতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আসতে পারে। লেখক নিজেও নিজের লেখার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারেন। আমার প্রথম জীবনে মা অপছন্দ করতেন আমার লেখার কাজটিকে। এক সময়ে আমার বড় বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে চিঠি এসেছিল, যার বক্তব্য ছিল এরকম- 'এই পরিবারের একটি মেয়ের হস্তাক্ষর পরপুরুষেরা দেখিতেছে, ইহা উভয় পরিবারের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়।' আমার বাবা 'হাইকোর্টের এই রুল জারি' দেখে আমাকে ডেকে বললেন যে আর লেখালেখি চলবে না। বাবার নিষেধাজ্ঞা শুনে খুব কেঁদেছিলাম সেদিন। বিয়ের পরে এই প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হলো। আমার স্বামী খুবই উৎসাহ দিতেন লেখালেখিতে। তিনি পড়ুয়া ব্যক্তি ছিলেন। রেশন আনতে টাকা দিয়েছি। অথচ তিনি রেশনের বদলে বই কিনে নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। এমন ঘটনাও ঘটেছে। আর পাঠকদের চিঠি, মন্তব্য- এই সব খুব প্রেরণা দিতো আমাকে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনও ছিলেন আমার লেখালেখির জন্যে অনুকূল মনোভাবের। আমার ছেলেমেয়েরা আগাগোড়াই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের দেশে লেখকের প্রথম অনুপ্রেরণা তিনি নিজেই, এরপর তার পরিবার এবং বৃহত্তর পাঠকশ্রেণী।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**